The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 17, No. 33-34, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098, e-ISSN 2408-851X
DOI : http://dx.doi.org/10.70438/dujl/173334/0010

অরওয়েল এবং হাই: রাজনীতির ভাষার সমকালীন ও তুলনামূলক পুনর্পাঠ

মাশরুর ইমতিয়াজ*

Abstract: This article offers a contemporary and comparative reinterpretation of political language, and it explores the vital role of language as it shapes the individual and collective consciousness and its function as a powerful political tool. This analysis is conducted in the context of George Orwell's 'Politics and the English Language' and selected essays from Muhammad Abdul Hai's 'Toshamod O Rajinitir Bhasha (The Language of Ingratiation and Politics)', both of which offer impartial demonstrations of political language. Both Orwell and Hai, demonstrated how language serves as a potent tool of political influence by depicting the realities of their respective eras. However, their approaches to presentation, elaboration, analysis, and expressive style differ. In addition to the comparison and contrast to the works of Orwell and Hai, this article seeks to examine how, across diverse cultural and historical contexts, both authors have upheld linguistic clarity and individual linguistic freedom as the stronghold against political manipulation.

Keywords: Language and Politics; Linguistic Freedom; Linguistic Clarity; Language of Protest; Language and Identity.

১.

ভাষা মাত্রই শব্দের সংগ্রহ এবং ব্যাকরণগত নিয়ম নয়, বরং তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু যা সামাজিক সংজ্ঞাপনের মূল প্রপঞ্চ হিসেবে রাজনৈতিক মতাদর্শ, পরিচয় এবং ক্ষমতা কাঠামোকে মূর্ত করে। একইসাথে ব্যক্তির চিন্তা এবং সামষ্টিক সামাজিক চেতনা, উভয় গঠনেই কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, মূলত ভাষা। এই প্রবন্ধটিতে মূলত রাজনীতির ভাষার সমকালীন ও তুলনামূলক পুনর্পাঠ সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে কীভাবে ভাষা একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে; জর্জ অরওয়েলের ‘পলিটিক্স অ্যান্ড দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ’ যার অনুবাদ ‘রাজনীতি এবং ইংরেজি ভাষা’ এবং মুহম্মদ আবদুল হাই প্রণীত ‘তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা’ বইয়ের কয়েকটি প্রবন্ধের আলোকে এই বিশ্লেষণ করা হয়েছে, মূলত এসব লেখায় রাজনীতির ভাষার বিশ্লেষণ অনুসন্ধান করা হয়েছে নির্মোহভাবে। অরওয়েল এবং হাই,

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

একইসাথে তাঁরা ভাষা, ভৌগোলিক অবস্থান, দশকগত জীবনাচারণ এবং সংস্কৃতির একদমই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজমান ছিলেন; তবুও উভয়েই তাদের এই দুই বহুল পঠিত এবং 'ক্ল্যাসিক' বা চিরায়ত পাঠ বা টেক্সটের পরিচিতি পাওয়ায় প্রবন্ধসমূহে রাজনৈতিক ভাষার আলোচনায় স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, ভাষাএকইসাথে মানুষের ধারণাগত বিষয়সমূহকে স্থানান্তর করে এবং সক্রিয়ভাবে সমাজের মধ্যে ব্যক্তির রাজনৈতিক বোধ, পরিচয় এবং ক্ষমতার কাঠামোর সম্পর্কযুক্ততাও গঠন করে। অরওয়েলের প্রবন্ধ ইংরেজি রাজনৈতিক ভাষার হেরফের নিয়ে সমালোচনা করে, এবং দেখিয়ে দেয় যে কীভাবে অস্পষ্ট এবং বিভ্রান্তিকর ভাষা সত্যকে বিকৃত করতে পারে (এমন ধারণাকেই বর্তমানে ‘উত্তর-সত্য’ বা পোস্ট-ট্রুথ হিসেবে বর্তমান সময় চিহ্নিত করে), চিন্তা-সত্ত্বাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ক্ষমতার শ্রেণীবিন্যাস রক্ষা করে শাসক-শাসিতের দ্বৈততাকে টিকিয়ে রাখে। এমনই সমান্তরাল প্রেক্ষিতে, মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের লেখায় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান যা বর্তমানের বাংলাদেশ, এই ভূখণ্ডের ভাষার রাজনীতিকে নির্মোহভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে, ভাষা কীভাবে রাজনৈতিক দমনের মাধ্যম এবং সাংস্কৃতিক সংহতির প্রতীক হয়ে ওঠে, বিশেষ করে চাপিয়ে দেওয়া ভাষাগত আধিপত্যবাদের ভিত্তিতে-তারই সবিশেষ বর্ণনা করা হয়েছে আবদুল হাই-র রাজনৈতিক ভাষার আলোচনায়। এই প্রবন্ধটি অরওয়েল এবং হাই-র লেখার পুনর্পাঠ ও তুলনা ছাড়াও, বিশ্লেষণ করতে চায় যে কীভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জুড়ে অরওয়েল এবং হাই উভয়ই রাজনৈতিক কারসাজির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা হিসাবে ভাষিক স্বচ্ছতা এবং ব্যক্তিমানসের ভাষিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে তাদের অবস্থান তুলে ধরেছেন।

২.

পরিবেশ ও প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করে তাই প্রতিবেশ। বর্তমানের রাজনীতি সংশ্লিষ্ট পরিবেশ বলতে মানুষের চারপাশের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার যাপনকেই যদি আমরা মুখ্য বিষয়রূপে অভিহিত করি, তাহলে ভাষিক প্রতিবেশ মূলত মানুষ এবং তার চারপাশের রাজনৈতিকতার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার কথকতারই মূর্তরূপ। বর্তমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনীতির ও ভাষার পারস্পরিক সংশ্লেষণমূলক সহাবস্থান আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করে থাকি, যদিও এই প্রত্যয়সমূহ আদি থেকেই রাজনৈতিক পরিসরে অন্তর্নিহিত অবস্থায় থাকে। একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির আওতায় সমন্বিত থাকে ঐ ভাষিক অঞ্চলের মানুষের রাজনীতি-সমন্বিত আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস-বোধ, কর্ম-সিদ্ধান্ত ইত্যাদিসহ এমন সবকিছুই যেগুলোর প্রত্যেকটির ভাষিক রূপায়ণ সম্ভব। ইয়াকভলেভ (১৯৭৫) এর উদ্ধৃতি এখানে স্মর্তব্য-

> “মানুষের শ্রম তার সচেতনতার সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু সচেতনতা আবার কথা ও ভাষার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, এই ভাষার সাহায্যেই লোকে মেলামেশা করে, পরস্পরকে নিজেদের মনোভাব জানায়। উচ্চারিত ভাষা কেবল মানুষেরই প্রকৃতিসিদ্ধ প্রত্যেকটি নতুন মানুষ জীবন শুরু করতে গিয়ে ভাষা আয়ত্ত্ব করতে

বাধ্য, এ ছাড়া কোন সমবেত ক্রিয়াকলাপ অসম্ভব।... কথার সাথে থাকে সাধারণীকরণের, বিমূর্ত চিন্তার অর্থাৎ বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের মানবিক সামর্থ্য। এইভাবে শ্রম, চেতনা, ও কথা, তিনে মিলে মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে গুণগতভাবে পৃথক করে দিয়েছে, সমবেত ক্রিয়াকলাপে সক্ষম করে তুলেছে, যেটা শুধু মানুষেরই বৈশিষ্ট্য।"

সমকালের রাজনীতি একইসাথে ধারণ করে রাজনৈতিক নিস্পৃহতা এবং দুর্বৃত্তায়ন একথা খুব যে রূপকথার গল্প তাও নয় বটে। অরওয়েলের 'পলিটিক্স অ্যান্ড দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ' একবিংশ শতকেও ইংরেজিভাষী মানুষেরা কীভাবে ভাষার রাজনৈতিক অবকাঠামোর সাথে সম্পর্কিত, এবং রাজনৈতিক ভাষ্য কীভাবে ভাষার মূল ব্যবহার ও পরিসরকে ক্ষয়িষ্ণু করে তা নিয়ে সমান প্রাসঙ্গিক। অরওয়েলের দৃষ্টিতে, ভাষা রাজনৈতিক কুশীলবদের দ্বারা একটা অস্বাভাবিক রূপ লাভ করে যেন তা সত্য বা বাস্তবতাকে অস্পষ্ট করতে পারে। সেইসাথে ঐ রাজনীতিকেরা জনসাধারণের উপলব্ধি বা বোধকে একটি নিয়ন্ত্রিত রূপ দিতে এবং সমালোচনামূলক চিন্তার ক্ষমতাকে সীমিত করার জন্য সুভাষণ (euphemism), অপশব্দ (jargon), এবং অশুদ্ধতা (imprecision) প্রভৃতি ভাষিক কৌশলের আশ্রয় নেয়। অরওয়েল আরও সতর্ক করেন এই বলে যে, ভাষা, যখন এসব কৌশলের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে রাজনৈতিক বক্তব্য আকারে পৌঁছায় তখন এটি এমন উপকরণ হয়ে যায় যে তা কোনো ব্যক্তিকে সত্যভাষণ এবং সমালোচনামূলক একটা বোধ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে তোলে- এটি আদতে নিজস্ব চিন্তাহীনতার দিকে নিয়ে একটা আদর্শগত কৌশল (বা অপকৌশলও) বটে। ভাষিক প্রতিবেশের সমকালীন পাঠে তাই তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষার সুলুক-সন্ধান এক উৎসাহী বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতেই পারে- একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়। মুহম্মদ আবদুল হাই, যিনি বাংলা ভাষার এক অন্যতম ব্যাকরণিক প্রতিভা এবং উল্লেখ্য স্বরের অধিকারী, তিনি প্রবন্ধকার হিসেবেও তার সক্ষমতার কলমের ধার দেখিয়েছেন তার 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা' বইটিতে। এই প্রবন্ধের শুরুর দিকে তাই যা বলা হলো, এর ভিত্তিরূপ অরওয়েলের 'পলিটিক্স অ্যান্ড দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ' এবং মুহম্মদ আবদুল হাই এর উল্লিখিত বইয়ের দুই প্রবন্ধ, যথাক্রমে 'তোষামোদের ভাষা' এবং 'রাজনীতির ভাষা'। বর্তমান আলোচনায় আমরা সমকালীন প্রেক্ষিতে রাজনীতির ভাষা কীভাবে ক্রিয়াশীল থাকে এবং সে অনুযায়ী তাত্ত্বিকভাবে আমরা কীভাবে সমকালীন রাজনীতির ভাষিক প্রতিবেশের অঞ্চলসমূহের শ্রেণিকরণের প্রয়াসী হবো। একইসাথে আলাদা আলাদা আঙ্গিক বিবেচনায় রাজনীতির ভাষার স্বরূপ ও প্রয়োগের তুলনামূলক পাঠের একটা বাস্তবিক দৃশ্যায়ন উপস্থাপন করার সূত্র ধরে আলোচনার ধারাবাহিকতায় বর্তমানের ভাষিক পরিবর্তনে একটি রেখার বাঁকবদলের ধাঁচটিও আলোচনা করা হবে।

অরওয়েল এবং হাই উভয়ই রাজনৈতিক প্রভাবের একটি শক্তিশালী উপকরণ হিসাবে ভাষার ভূমিকাকে উপস্থাপন করেছেন প্রকাশকালীন সময়ের যথাযথ বাস্তব উপস্থাপন তুলে ধরার মাধ্যমে। যদিও উপস্থাপনের প্রক্রিয়া, বিশদীকরণ, বিশ্লেষণ, প্রকাশগত আঙ্গিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিস্তর পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিলো। অরওয়েল পশ্চিমা রাজনৈতিক

বক্তৃতায় ভাষার হেরফের যেভাবে জনমানসে বিভ্রান্তির জন্ম দেয় এবং ক্রমাগতভাবে অসংবেদনশীল করে তার জোরালো সমালোচনা করেছেন। রাজনৈতিক বাস্তবতার উপর রঙ চড়াতে এবং সমালোচনাকে কীভাবে মানুষের কাছে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় এ নিয়ে কথা বলেছেন তিনি, একইসাথে অশুদ্ধ ভাষার ব্যবহারের সাথে আরও নানা রকমের ভাষিক কৌশলসমূহ উল্লেখ করেছেন তার লিখিত বয়ানের সমর্থনে। বিপরীতভাবে, হাইয়ের মূল আলোকপাতের ক্ষেত্র হচ্ছে উত্তর-ঔপনিবেশিক, এবং সদ্য মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে কীভাবে দক্ষিণ-এশীয় ভাষিক অভিজ্ঞতায় রাজনীতি মিশ্রিত থাকে। সেখানে ভাষাগত আধিপত্য যেভাবে বিরাজমান সাংস্কৃতিক পরিচয়কে শাসন করার এবং বিপুল জনগোষ্ঠীর উপর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার একটি শাসক-পদ্ধতি হয়ে ওঠে। এই পার্থক্য সত্ত্বেও, অরওয়েল এবং হাই উভয়ই মূলসুরে এটাই বলেন যে ভাষা কখনই নিরপেক্ষ নয়।

ভাষা, ক্ষমতা এবং বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক দীর্ঘকাল ধরে সমালোচনামূলক তত্ত্বের (Critical theory) একটি কেন্দ্রবিন্দুতেই অবস্থান করছিলো। মিশেল ফুঁকো এবং পিয়েরে বোর্দিউ-র মতো বিদগ্ধ তাত্ত্বিকজনেরা কীভাবে সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ন্ত্রণের একটি উপকরণ হিসাবে ভাষা কাজ করে তার ভিত্তিগত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছেন। ডিসকোর্স তত্ত্বের উপর ফুঁকোর কাজ (১৯৮১) বলে যে ভাষা যে কেবলমাত্র ধারণাকেই প্রকাশ করে তাই নয়, বরং সক্রিয়ভাবে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া সংগঠন করে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করেও থাকে। একইসাথে কীভাবে সামাজিক ব্যক্তিমানুষেরা সামাজিক বাস্তবতা বুঝতে পারে এবং সেইসঙ্গে সম্ভাব্য চিন্তাকাঠামোর উন্মুক্ত-অসীম সম্ভাবনাকে সীমিতও করে দেয়। ফুঁকোর ধারণা অনুযায়ী, ভাষা হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শক্তি সমাজের মধ্যে প্রোথিত এবং স্থায়ী হয়; আর যারাই ভাষাকে (মূলত, তারা রাজনীতিকবৃন্দই- অরওয়েল এবং হাই-র লেখনী অনুসারে) নিয়ন্ত্রণ করে, তারা শুধু কী বলে দেয়া যায়, সেটিই নয় বরং এর এই বয়ানের ব্যাখ্যাযোগ্যতাও কেমন হয়- তাও নির্ধারণ করে দেয়। ফুঁকোর এই ধারণাই রাজনৈতিক ভাষা সম্পর্কে অরওয়েলের উদ্বেগসমূহকে সমর্থন করে, যেখানে সুভাষণ (ইউফেমিজম) এবং অপশব্দ (জার্গন) সত্যবয়ানকে একটা ছদ্ম প্রলেপ দেয়ার, মুক্তচিন্তাকে সীমিত করার, এবং আদর্শিক ধারণার প্রভাবক প্রয়োগের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। 'পলিটিক্স অ্যান্ড দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ' এই লেখায় অরওয়েলের সমালোচনা ফুকোর বক্তব্যকেই প্রতিফলিত করে দেখায় যে কীভাবে রাজনৈতিক ভাষা বাস্তবতাকে অস্পষ্ট করে এবং সীমাবদ্ধ করে; নাগরিকদের ভাষায় সক্রিয় ও সমালোচনামূলক অংশগ্রহণকারীদের কীভাবে সক্রিয় থেকে নিষ্ক্রিয় করতে কীভাবে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভূমিকা রাখে। পিয়েরে বোর্দিউ (১৯৯১) এর ধারণা অনুযায়ী 'ভাষিক পুঁজি' মূলত ভাষা এবং ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো প্রদান করে যা মূলত গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক আধিপত্যের প্রেক্ষাপটে। বোর্দিউ জানান, ভাষা পুঁজির একটি রূপ হিসাবে কাজ করে যা সমাজের মধ্যে কর্তৃত্ব এবং মর্যাদা প্রকাশ করে; যারা প্রভাবশালী তারাই ভাষাগত চিহ্নসমূহকে (লিঙ্গুইস্টিক কোড) নির্ধারণ করে এবং মূলত সেই ক্ষমতাশালীরাই বৃহত্তর প্রতীকী ক্ষমতা ধারণ করে। বোর্দিউ-র ধারণাগুলো বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষায় আবদুল হাই-এর

অন্বেষণকে বোঝার জন্য একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়, যেখানে তৎকালীন বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর উপর ক্ষমতাসীনদের প্রযুক্ত ভাষিক চিহ্নসমূহ সামাজিক-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় হিসাবে এবং একটি প্রভাবশালী ভাষাগত কৌশল প্রয়োগ করার একটি চেষ্টাকেই মূর্তায়ন করে। এই ভাষাগত শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে বোর্দিউ-এর দৃষ্টিভঙ্গি এক অর্থে হাইয়ের সমালোচনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে; এবং স্পষ্ট করে যে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয় বরং একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সংজ্ঞাপন মাধ্যম যেখানে পরিচয়, প্রতিরোধ এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব একে অন্যের সাথে মিশে যায়। একসাথে যদি আলোচনা করা যায়, তবে আমরা প্র্যত্যক্ষ করি, ফুঁকো এবং বোর্দিউর তত্ত্বগুলো ভাষা সম্পর্কে অরওয়েলের এবং হাইয়ের মতামত বিশ্লেষণের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদানসাপেক্ষে এই দুই ক্ল্যাসিক প্রবন্ধকারের সমসাময়িকতাকেই সমর্থন করে। কারণ, অরওয়েল এবং হাই- দুজনেই কীভাবে ভাষা ব্যবহারিকতার নিরিখে নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসাবে কাজ করে, সমকালীন চেতনাকে আকার দেয় এবং রাষ্ট্রক্ষমতা কাঠামোকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে তোলে জনসাধারণের বিপরীতে তা নিয়ে স্বকীয় আলোচনাই আসলে করেছেন। আদতে, কারসাজিমূলক রাজনৈতিক ভাষার দ্বারা সৃষ্ট মতাদর্শগত ধোঁয়াশার দিকেই অরওয়েলের মূল নির্দেশ এবং ভাষিক নিয়ন্ত্রণের হিসাবে মাধ্যম ভাষার ব্যবহারই হচ্ছে হাইয়ের মূল আলোকপাত তাঁদের লেখনীর পার্থক্যের দিকে তাকালে এমনটা বোঝা যায়। অরওয়েল এবং হাই, উভয়ই উল্লিখিত তাত্ত্বিকদের মূল দাবিকে প্রতিফলিত করেন এইভাবে: ভাষা সহজাতভাবে রাজনৈতিক, আধিপত্য এবং ভিন্নমত তৈরি এবং নিরসনের একটি তুমুল সফল হাতিয়ার। রাজনৈতিক ভাষার প্রভাব যে খুব স্পষ্ট বা সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায়, বর্তমানেও তা নিয়েও রয়েছে দ্বিমত, এখনও। রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর রাজনৈতিক ভাষার "অবচেতন" প্রভাব পরোক্ষ এবং তা শ্রোতা বা পাঠকের সচেতনতার বাইরে ঘটবে (Geis, 2012)।

অরওয়েল এবং হাই উভয়েই কীভাবে আখ্যানভিত্তিক (thematic), প্রতিবেশভিত্তিক (contextual), এবং কার্যকরী (functional) তুলনার উপর ভিত্তি করে ভাষা এবং রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করেছেন- এই প্রবন্ধ মূলত সেটিরই অন্বেষণ করছে। আখ্যানভিত্তিক তুলনায় আমরা দেখতে পাই যে এই দুই লেখকই কিছু সমধর্মী ধারণা পোষণ করেন, যেমন - ভাষাকে প্রয়োগ করা হয় রাজনীতির ভাষা হিসেবে এবং এই প্রয়োগের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের চিন্তাকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করা, মূলত ভাষিক অস্পষ্টতার মাধ্যমে অসত্য উপস্থাপন করা। একে এক অর্থে পরোক্ষ ভাষিক দমনও বলা যায়। তারা উভয়েই এটাও জোরালোভাবে বলেছেন যে কীভাবে রাজনৈতিক কারসাজির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের উপায় হিসাবে ভাষাগত স্বচ্ছতা এবং সম্পূর্ণ উপস্থাপনের মাধ্যম হিসেবে ভাষা কীভাবে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে এবং তা থাকা উচিতও বটে। আরও জানানো হয়েছে যে, প্রতিবেশগত বিশ্লেষণ, স্বতন্ত্র সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমি পরীক্ষা করে যা ভাষা রাজনীতিতে প্রতিটি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন তা উপস্থাপন করে। অরওয়েলের সমালোচনা বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ডে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যেখানে রাজনৈতিক ভাষা ক্রমবর্ধমানভাবে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ এবং শ্রেণী বিভাজনের নৃশংস বাস্তবতাকে

এমনই এক ভাষিক মুখোশ দিয়েছিল। অন্যদিকে হাই, অবশ্য উত্তর-ঔপনিবেশিক দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটের মধ্যে থেকে লিখেছেন, যেখানে তৎকালীন পাকিস্তান আমলে ভাষানীতিসমূহ কীভাবে ভাষাগত আদর্শিকতার সম্যক প্রয়োগ দূরে সরে আসছিলো এবং বাংলাভাষী মানুষকে প্রান্তিক করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গগুলিকে একত্র করে, এই প্রবন্ধ দেখাতে চায় কীভাবে অরওয়েল এবং হাই-র স্বতন্ত্র পরিবেশগুলো ভাষাগত নিয়ন্ত্রণের নির্দিষ্ট রূপসমূহের তাঁরা যে সমালোচনা করেছেন তাকে প্রভাবিত করেছিল, সেইসাথে ভাষাগত প্রতিরোধের বিভিন্ন কৌশল বা অভিব্যক্তিগুলোকে তারা সমর্থন করেছেন সেগুলো সার্বিকভাবে কতটা সমসাময়িকভাবে প্রাসঙ্গিক।

সবশেষে, কার্যকরী তুলনা বিশ্লেষণ করবে যে কীভাবে লেখকদ্বয় সমাজের মধ্যে ভাষার ভূমিকাকে চিহ্নায়ন করেন। একটি কার্যকরী রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য উপাদান হিসাবে ভাষাগত স্বচ্ছতার উপর অরওয়েল জোর দিয়েছেন; অন্যদিকে, ভাষিক আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের সূচক হিসেবে হাই তার দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করেছেন। যদিও অরওয়েল ভাষাকে সত্য ও যৌক্তিকতার সংযোগকারী উপাদান হিসেবেই দেখেন , এবং তাঁর মতে অবশ্যই ভাষাকে রাজনৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে হবে। হাই সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে ভাষাকে স্থান দিয়েছেন, যাকে অবশ্যই অর্থগত বাহ্যিকতার আরোপের বিরুদ্ধ-অবস্থানে রাখা উচিৎ। একইসাথে, এই কার্যকরী পার্থক্যগুলি মূর্ত করে কীভাবে অরওয়েলের এবং হাইয়ের বিশ্লেষণগুলি একে অপরের পরিপূরক, রাজনৈতিকতা ও ভাষার মধ্যে একটি বিশদ সংযোগকারী প্রপঞ্চ হিসেবে তাঁদের লেখনী সক্রিয় ছিলো। থমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯), যাকে অনেক তাত্ত্বিকই মনে করেন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক, তিনি দার্শনিকতার বিচারে একইসাথে রাজনীতির ভাষা ও ভাষার রাজনীতির বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও আঙ্গিক নিয়ে প্রায়শই আলোচনা করেছেন। এছাড়াও হবসের ধারণায় যে কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে ঐ রাজনীতির ভাষার দার্শনিক বিচার সম্পৃক্ত থাকে। রাজনীতির ভাষার আওতায় তিনি মানুষের আলাপে নৈতিকতার অবস্থান, বাক-কৃতি বা স্পিচ অ্যাক্টের ভেতর থাকা ব্যক্তিস্বাধীনতা, একটা সরল সাধারণ ভাষার উপস্থিতি যা সহজাত, সামাজিক, এবং পরিপূর্ণভাবেই ভাষিক ইত্যাদির প্রসঙ্গে এনেছেন বিভিন্নভাবেই। অন্যদিকে ভাষার রাজনীতিতে কূটভাষিকতার প্রাবল্য, ধর্মীয় বয়ানের সংযুক্ততা এবং ক্ষমতাকাঠামোর সাথে ভাষিকতার সম্পর্ককেই বর্ণনা করেছেন (Biletzki, 1997) ।

৩.

'পলিটিক্স অ্যান্ড দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ'- এই প্রবন্ধে জর্জ অরওয়েল দেখিয়েছেন, ভাষার ক্রমাবনতি কেবলই সাংস্কৃতিক পতনের প্রতিফলন নয়, বরং আরোপিত এক গভীর রাজনৈতিক পরিণতির জন্য দায়ী সক্রিয় এক প্রক্রিয়া। অরওয়েলের মতে, ভাষার ক্ষয় বা অস্পষ্টতা, ছলচাতুরীমূলক কথাবার্তা এবং ইচ্ছাকৃত অশুদ্ধতা, অর্থগত রকমের হেরফের করার জন্য একটি জটিল রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করে। তিনি এও পরামর্শ দিয়েছেন যে রাজনৈতিকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে- সত্যকে অস্পষ্ট করতে, দায়িত্ব এড়াতে

এবং জনমতকে প্রভাবিত করতে ভাষার এই দুর্বলতাগুলিকে কাজে লাগান। এ নিয়ে অরওয়েল সতর্ক করেছেন যে, এইসব ভাষিক আরোপ এমন একটি সমাজের দিকে আমাদের নিয়ে যায় যেখানে জনমানুষেরা ক্রমশ বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং ফলবশত রাজনৈতিক বিবৃতির পিছনের উদ্দেশ্যসমূহকে সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করতে অসমর্থ হয়।

অরওয়েল বিশেষ করে সুভাষণ (euphemism), অপশব্দ (jargon), এবং অশুদ্ধতা (imprecision), কর্মবাচ্যভিত্তিক ভাষিক সংগঠন প্রভৃতি ভাষিক কৌশলের উল্লেখ করেছেন যা আদতে বাগর্থকে অস্পষ্ট করে। সুভাষণ রাজনীতিবিদদের চলমান সমস্যাপূর্ণ বাস্তবতাকে বিভিন্ন কোমল বা বিভ্রান্তিকর শব্দকে ছদ্মবেশের মোড়কে রূপ দেয়। যেমন 'কোলাটেরাল ড্যামেজ' কিংবা 'এক্সটেন্ডেড ইন্টেরোগেশান' এসব শব্দবন্ধ এমন সব অভিব্যক্তি দেয় যা বেসামরিক যুদ্ধকালীন বেসামরিক মানুষের হতাহতের বা নির্যাতনের কঠোরতাকে অনেকাংশেই কমিয়ে বা নরমসুরে উপস্থাপন করে। বাংলা ভাষায় 'জানমালের ক্ষতি', 'অনাকাঙ্খিত মৃত্যু', 'নিরাপত্তা হেফাজত' এসব শব্দের নিয়মিত ব্যবহার আমরা দেখতে পাই বিচার বহির্ভূত বিভিন্ন প্রাণহানির ঘটনার রাজনৈতিক বয়ানে। এমনকি এমন শব্দ ব্যবহারের নমুনা আমরা ইজরাইল-ফিলিস্তিন সংক্রান্ত নিয়মিত সংবাদেই প্রত্যক্ষ করে থাকি। তাছাড়াও অপশব্দ প্রায়শই ঘোরালো এবং জটিল ভাষাকে সাধারণ জনগণের কাছে অবোধ্য করে তোলে, এবং এমন এক বাধা নির্মাণ করে করে যা সাধারণ মানুষকে পরোক্ষভাবে ভয় দেখায় বা মূলচিন্তার জনস্রোত থেকে আলাদা করে দেয়। এছাড়াও, কর্মবাচ্যভিত্তিক বাক্যের ব্যবহার আসল প্রসঙ্গ থেকে সরিয়ে দেয়, যা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জবাবদিহিতাকে বিচ্যুত করার নিয়মিত নজির স্থাপন করে- উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'আমরা ভুল করেছি' এর পরিবর্তে প্রায়শই বলা হয় 'ভুল হয়েছিল'। অরওয়েলের মতে, এই ভাষাগত কৌশলগুলি সম্মিলিতভাবে জনসচেতনতাকে ক্ষয়িষ্ণু করে, জনসাধারণকে বাস্তবে রাজনৈতিকভাবে অসাড় করে দেয় এবং তাদের পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক দমনের শিকার করে তোলে। অরওয়েলের সমালোচনা বলে দেয় যে ভাষার এই ইচ্ছাকৃত রাজনৈতিক ক্ষয় শেষ পর্যন্ত মানুষের স্পষ্ট এবং সমালোচনামূলক চিন্তা করার ক্ষমতাকে হ্রাস করে এবং ক্ষমতাকে একটি রাজনৈতিক কৌশলে পরিণত করার একটি পদ্ধতি হিসাবে কাজ করে। অরওয়েল রাজনৈতিক বক্তৃতা এবং প্রচারের বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে ভাষার কারচুপির সম্ভাবনাকে চিত্রিত করেছেন, প্রকাশ করেছেন কীভাবে রাজনৈতিক নেতারা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভাষা ব্যবহার করেন। অরওয়েল ভাষার 'মাস্টার ম্যানিপুলেটর' হিসাবে ক্ষমতাকেন্দ্রিক শাসনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, এবং উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন বেশ কিছু শব্দ যা আদতে নিপীড়ন ও নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, দেখা যায় যে কীভাবে 'পিসফুল কোএক্সিসটেন্স (শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান)' বা ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম (গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা)' এর মতো বাক্যাংশগুলিকে কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো পরিশীলিত পরিভাষায় নিপীড়নমূলক নীতি তৈরি করতে ব্যবহার করে। আসলে এইভাবে তৈরি করা হয় একটি ভাষাগত ধোঁয়াশা, যা রাজনৈতিক বাস্তবতাকে আড়াল করে। এ ধরনের বাক্যাংশগুলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে আড়াল করে এবং

জনসাধারণকে তাদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে বাধা দেয়, এটিই নিশ্চিত করে যে জনমানুষেরা কোন সমালোচনা ছাড়াই রাজনৈতিক এসব প্রচারণা গ্রহণ করবেন। এই প্রসঙ্গে অরওয়েল আরও বলেন, এই রাজনৈতিক আরোপের কারণে ভাষার যে ক্ষয় তা কোন 'বাজে লেখনীর' কারণে ঘটে বিষয়টি এমন নয়, বরং এটির পেছনে থেকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণসমূহ –

> 'Now, it is clear that the decline of a language must ultimately have political and economic causes: it is not due simply to the bad influence of this or that individual writer.'

এমতাবস্থায়, তিনি তালিকা দিয়েছেন এমন কিছু ভাষিক কৌশলের যা রাজনীতির ভাষায় ধোঁয়াশাপূর্ণ অর্থ তৈরিতে নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে –

- মৃতপ্রায় রূপক, যা খুবই কম ব্যবহৃত হয় (dying metaphors)
- কার্যকারক, বা মৌখিক মিথ্যা-ভাষ্য (operators, or verbal false lingo)
- ছলনামূলক কথাবার্তা বা বাকচাতুরি (pretentious diction)
- অর্থহীন শব্দ (meaningless words)

যদিও তিনি উপসংহারে পৌঁছেছেন এই বলে যে রাজনৈতিক বয়ানে ও লেখনীতে ইংরেজি ভাষার যে পতন, তাকে ছয়টি সংশোধনের সূত্র মেনে বিপরীতমুখী করা সম্ভব, যদি এসব নিয়ম আদর্শরূপে মানা হয়। তার ধারণামতে, এসব ভাষিক আদর্শ অনুসৃত হলে, রাজনৈতিক ভাষ্যের অনেক সমস্যাই সমাধানের মুখ দেখবে। একইসাথে জনসাধারণের উপর যে আরোপ ও নিয়ন্ত্রণের ভাষিক কৌশল তা অনেকাংশেই লুপ্ত হবে। অরওয়েলের বর্ণিত সূত্রসমূহ নিম্নরূপ –

- এমন কোনো রূপক, উপমা, বা বক্তৃতার নমুনা ব্যবহার না করাই শ্রেয় যেসব আমরা ইতোমধ্যেই মুদ্রণে দেখতে অভ্যস্ত, কিন্তু তার ব্যাখ্যা বা উৎপত্তি আমরা অনেকাংশেই জানি না। অরওয়েলের দেয়া উদাহরণ ছিল 'একিলিস হিল' যা গ্রিক মিথের সাথে যুক্ত, তেমনিভাবে 'অগস্ত্যযাত্রা' শব্দটি এসেছে ভারতীয় মিথ থেকে। এগুলোর যথার্থ উৎপত্তি এবং ব্যবহার না জেনেই এসবের প্রয়োগ হয়তো ভুলভাবেই করা হয়ে থাকে।
- যেখানে একটি ছোট শব্দ ব্যবহারে কাজ হবে, সেখানে দীর্ঘ শব্দ ব্যবহার অনুচিত।
- যদি মূল অংশ থেকে একটি শব্দ ছেঁটে ফেলার সুযোগ থাকে, সবসময়েই তা ছেঁটে ফেলা উচিত।
- যদি কর্তৃবাচ্য ব্যবহারের করা যায়, সেখানে কর্মবাচ্য ব্যবহার করা যাবে না।
- কখনোই বিদেশি ভাষার ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও অপশব্দ ব্যবহার কাম্য নয়, যদি সেটির একটা দৈনন্দিন ব্যবহার্য সমশব্দ থাকে।

- অসভ্য বা বর্বর কিছু বলা বা লেখার চেয়ে উপরের নিয়মগুলোর যে কোনো একটি ভঙ্গ করা যেতে পারে।

সংক্ষেপে বলা যায়, ভাষা কীভাবে ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, সেভাবে কাজ করতে গিয়ে কীভাবে ভাষার ক্ষয় হয়ে রাজনীতির ভাষার জন্ম হয় সুনিপুণ কৌশলে। ভাষাগত ক্ষয় সম্পর্কে তার এমন বিশ্লেষণ কেবল সেই কৌশলগুলিকে স্পষ্ট করে করে তাইই না, বরং এর প্রতিরোধে কীভাবে ভাষিকভাবে জনমানুষ কীভাবে সচেতন হবে, তা সূত্রাবদ্ধ করেছেন অরওয়েল সচেতন লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকেই। বোধকরি, জর্জ অরওয়েল ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত তার আরেকটি ক্ল্যাসিক 'নাইন্টিন এইটিফোর' উপন্যাসে এক দুঃস্বপ্নলোকের (ডিস্টোপিয়ান) পটভূমিতে তুলে ধরেছেন, কীভাবে 'বিগ ব্রাদার' নামের প্রবল কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্র মানুষের ভাষা, চিন্তা, এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর প্রবল হস্তক্ষেপ করে। এমনকি সেই উপন্যাসে 'নিউস্পিক' এক কৃত্রিম ভাষার নমুনা তিনি দেখিয়েছেন যে ভাষার রাজনৈতিক ব্যবহারের কাল্পনিক স্বরূপ কেমন হতে পারে, এবং সেটিও ভাষার নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষেই। সুতরাং, ভাষার রাজনীতির আলোচনার ক্ষেত্রে যুক্ততা আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি বহুবিধ আঙ্গিক থেকেই- তার সমুদয় লেখনী এসব প্রতিভাত হয়েছে সাবলীলভাবেই।

৪.

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) ১৩৬৪'র ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা 'সমকাল' পত্রিকায় 'তোষামোদের ভাষা' এবং ১৩৬৫'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'রাজনীতির ভাষা' এই দুই শিরোনামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয় 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা' গ্রন্থটি যেখানে আরও কিছু প্রবন্ধ ও কয়েকটি গল্প ছিলো যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে 'ভাষার কথা', 'ভাষা ও ব্যক্তিত্ব', 'ধ্বনির ব্যবহার', 'সুভাষণ', 'কথা শেখা', এবং 'কথা শেখা' প্রভৃতি। 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা' সংকলনের যে ভূমিকা লিখেছেন, সেখানে নিজেই বলেছেন, পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থনে লেখা 'ওরা ও আমরা' শীর্ষক যে রচনায় সে সময়ের কিছু সাহিত্যিক গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হয়েছিলেন সেটি উল্লেখ করেছেন শুরুতেই, এমনি এর পাঠ-প্রতিক্রিয়া হিসেবে 'শনিবারের চিঠি'র স্বনামখ্যাত সজনীকান্ত দাস একটি নিবন্ধও লিখেছিলেন যার শিরোনাম ছিলো অনেকটাই বিপরীতমুখী, 'তোমরা ও আমরা'। একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ঐ রচনার সময়কাল ১৯৪৬, যেটি রাজনৈতিক সময়ের এক টালমাটাল অবস্থার চূড়ান্তরেখায় অবস্থান করছিলো। এই আলোচনায় আমরা মূল পাঠ্য হিসেবে রাখছি, 'রাজনীতির ভাষা' প্রবন্ধটিকে আমরা পুনর্পাঠ করতে চাইছি রাজনৈতিক ভাষা দিয়েই এবং তুলনা করতে চাইছি অরওয়েলের লেখার সাথে। তবে, আলোচনার সংশ্লিষ্টতা অনুসারে ভাষা ও ভাষা প্রয়োগের কিছু ধারণা যেগুলো হাই পোষণ করতেন, এবং যেগুলো রাজনৈতিক ভাষার আলোচনায়ও অসামঞ্জস্য হবে না- এমন কিছু ধারণার তুলে ধরা যাক।

'ভাষার কথা' প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাই, আমাদের যাপিত জীবনে ভাষার স্থানের আংশিকতা নিয়ে খুব সামান্যই আমরা ভেবে থাকি এ প্রশ্ন উত্থাপন করেই প্রবন্ধের

সূচনা করেছেন। সামাজিক জীবন চালু রাখতে সমাজের মানুষ কতগুলো অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে যে শব্দ ব্যবহার করে থাকে তাই মূলত ভাষা- আবদুল হাই এটিই মূলত আমাদের জানাচ্ছেন। বিশ শতকের পূর্বে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের যে প্রবণতা ছিল সেটি থেকে বেরিয়ে এসে তৎকালীন সময় অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকে ভাষা বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সংযুক্ত করার যে প্রয়োজনীয়তা সেটি আব্দুল হাই উল্লেখ করেন এবং তিনি বলেন বর্তমান সময়ে ধ্বনি হচ্ছে ভাষার মূল এবং এক একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ডের অধিবাসীদের একেক রকম ধ্বনি বের করতে আমরা দেখে থাকি। 'ভাষা ও ব্যক্তিত্ব' প্রবন্ধে তিনি আরেকটি সংজ্ঞায়ন করেন, যেখানে ভাষার সহজবোধ্যতার দিকে তিনি নজর দিয়েছেন যা পূর্ববর্তী অরওয়েলিয়ান ধারণার সাথে মিলে যায়–

> 'ভাষা কথাটি বহুল প্রচলিত ও সহজবোধ্য, কিন্তু এ-কথাটির মধ্যে অনেকটা অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতা রয়েছে। প্রত্যেক মানুষ তো কথাই বলে, ভাষা বলে না। হ'তে পারে প্রত্যেক ভাষাভাষী যত কথা বলে তার সমষ্টি একটি ভাষারূপে পরিগণিত হয়।'

'তোষামোদের ভাষা' প্রবন্ধে তিনি আমাদের বলছেন, কথা তথা ভাষার কাজ মন হরণ করা, চোখের সাথে তার যে সম্পর্ক তা সোজাসুজি নয়, বাঁকাচোরা পথে। সুতরাং বক্তার আরোপিত অর্থ যে সরল থেকে বক্ররেখায় চলে তা নিয়ে দ্বিমতের কিছু তিনি উল্লেখ করেননি। তিনি আরও বলছেন- 'তোষামোদের ভাষার লক্ষ্য হলো শ্রোতার চিত্তকে বিবশ করা, মানবীয় দুর্বলতার সুযোগ নেয়া-অনেক সময় শ্রোতার ক্রোধকে শান্ত করা। সহজ বাংলায় মানুষের মনের ওপরে বড়শি ফেলা'। এই নজির আমরা বর্তমানের রাজনীতির ভাষায় হরহামেশাই দেখতে পাই, তা একটু ভাবলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবদুল হাইয়ের মতে আমরা দেখতে পাই কীভাবে ভাষার সামাজিক ব্যবহারের রূপটি বহুপাক্ষিক যোগাযোগের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল থাকে, 'রাজনীতির ভাষা' প্রবন্ধটিতে তিনি এই সূত্র ধরে আলোচনা করেন এভাবে–

> 'সমাজ জীবন গড়ে তোলার জন্যই মানুষের ভাষার উদ্ভব বলে সমাজ জীবনে ভাষার ব্যবহারের বেলায় তার সত্যকার স্বরূপটি ধরা পড়ে। ভাষার কাজ হলো পারস্পরিক সমঝোতা তা কমপক্ষে দুজনের মধ্যেই হোক কিংবা বহুজনের মধ্যেই হোক।...সমাজ জীবনের নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ক্ষেত্রোপযোগী যেসব শব্দের হার গাঁথা হয়, তা-ই ভাষাকে তার সামগ্রিক রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নানা ভাগে ভাগ করে দেয়। এ কারণেই সমাজ জীবনের বিচিত্র পরিবেশে ভাষারও বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।'

ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক ভাষা যে একটা পৃথক প্রপঞ্চ হিসেবে গড়ে ওঠে এবং ছড়িয়ে পরে, সে বিষয়েও তিনি জানান দিয়েছেন এভাবে- 'এ প্রসঙ্গেই সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অন্যান্য বিষয়ের মতো রাজনীতির ভাষারও স্বতন্ত্র স্বরূপের কথা ওঠে। বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন রকমের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজ নিজ নিজ ভাষায় উপযোগী শব্দ সৃষ্টি করে নেয়। এসব শব্দ

একদিনে সৃষ্টি হয়, তা নয়। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র যাদের হাতে থাকে, প্রয়োজনের তাগিদে তারা কিছু শব্দ এবং এর প্রকাশ প্রক্রিয়া বা ভঙ্গি সৃষ্টি করিয়ে নেন। প্রতিদিনের ব্যবহারে তার কিছু টিকে যায়, কিছু টেঁকে না'। যেভাবে রাজনৈতিক দলগুলো, তা হোক ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতার বাইরের তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তেই ভাষাকে ব্যবহার করেন নিয়মিতভাবে, হাই বলেছেন –

> 'রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার জন্যে প্রত্যেকটি দলই দেশের অধিবাসীদের কাছে তাদের আদর্শ ও কর্মসূচী নিয়ে উপস্থিত হয় আর সাধারণকে তাদের মতে দীক্ষিত করার জন্য ভাষার সাহায্যেই জোর প্রচারণা চালায়। অন্যকথায়, ভাষা রাজনৈতিকদের হাতের পুতুল হয়ে ওঠে। সে ভাষা দিয়ে তাঁরা তাঁদের নিজের বক্তব্য যেমন প্রচার করিয়ে নেন, তেমনি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যেও অপপ্রয়োগ করতেও কুণ্ঠিত হন না।'

ভাষা ব্যবহারে মানুষের যথেচ্ছ অধিকার থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রশ্নে মানুষকে এমনিভাবে সংকুচিত হয়ে যেতে হয়, মনের কথা পর্যন্ত মুখে এসে আটকে যায়। নিছক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে নিজের ভাষার ওপরেও সে তার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। আর রাষ্ট্র তার অনুসৃত আদর্শ প্রচারের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রচার বিভাগের মারফত ভাষা ব্যবহারের সবরকম মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে স্বদেশে ও বিদেশে তার মত বিস্তার করে দিতে মোটেও কুণ্ঠিত হয় না। ভাষা, রাজনৈতিকভাবে না হলেও, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে একত্রে আবদ্ধ করে। এদের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ সংহতি প্রচার করে থাকে এবং একটি জাতিগত বা জাতীয় পরিচয় প্রদানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবেও বিবেচিত হয় (Carol, 2001)।

রাজনীতির ভাষা যে রাষ্ট্রের ভাষা, এই সীমারেখা প্রায়শই মিলিয়ে যায় ক্ষমতার মুখপাত্র হিসেবে। তা সে পক্ষে বা বিপক্ষেই, এমনটাই ফুটে উঠেছে এই প্রবন্ধে –

> 'দেশের ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দল নিজেদের প্রয়োজনে তথ্য ও আদর্শ প্রচার করে নিজের দেশের জনমতকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু দেশের বাইরে থেকে কিংবা ভেতরে থেকেও তাদের বিরুদ্ধবাদীরা বই-পুস্তক ছাপিয়ে এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে এমন সব মতবাদের প্রচার করে যে, তাতে দেশের মত সম্পূর্ণ বিপরীত পথে গড়ে উঠতে পারে।'

ব্যক্তিমানুষের ভাষিক নিয়ন্ত্রণ যে মূল রাজনৈতিক ভাষার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রযুক্ত, এটা একেবারেই দ্বিধা না রেখে আবদুল হাই এভাবেই জানিয়েছেন। তবে তিনি এও জানিয়েছেন যে এই নিয়ন্ত্রণ আসলে ভাষার যে ব্যবহারিক শক্তির বিচিত্রতা তার সাথে একটা পাল্লায় থেকে যায়–

> 'হালআমলে সংবাদপত্র, রেডিও, সাহিত্য, সিনেমা প্রভৃতি ভাষা ব্যবহারের বিচিত্র বাহনগুলো ভাষার ব্যবহারমুখী শক্তিকে প্রচণ্ড গতি দান করেছে আর তাকে মারাত্মকভাবে শক্তিশালী করে তুলেছে।' আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভাষার বহুমুখীতাও এই ধারণার সাথে একদমই যথাযথ এবং এই ভাষিক শক্তির রূপ আমরা দেখেছি সমসাময়িক বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনেও।

রাজনীতির ভাষা যে ক্রমশতার শালীনতা হারায়, এবং তা মূলত রাজনীতিবিদদের অশিষ্ট ভাষা ব্যবহারের স্পষ্ট নমুনা, এই মন্তব্য টেনে আবদুল হাই প্রবন্ধটি শেষ করেছেন– 'নিজের ভাষার ওপরে মানুষের জন্মগত অধিকার থাকলেও দেশের রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুসারে তার ভাষা ব্যবহারের শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়- সে ভাষা সে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে না।' তিনি আরও বলছেন, ভাষা তখন আর আদর্শগত সংগ্রাম বা নীতি প্রচারের বাহন না হয়ে, হয়ে যায় কবিগানের খেউরের মতো এক ভাষিক বাহন। এবং আদর্শহীনতায় ভাষার মান নেমে যায় অচিন্ত্যনীয়ভাবে ক্রমশ নিচের দিকেই। অতীত রাজনৈতিক জীবনের দুর্গতির মধ্যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভাষা ব্যবহারের ক্লিশে এবং অসত্য ধরন উপস্থাপিত হয় অনেকাংশেই- তা এই মন্তব্যকেই সমর্থন করে এবং আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে এমন রাজনৈতিক ভাষ্য ও তার ভাষ্যকারের উপস্থিতি এখনও সমানভাবে উপস্থিত।

৫.

মিখাইল বাখতিন তাঁর ১৯৮৬ সালের প্রকাশিত বই 'Speech Genres and Other Late Essays'-এ আলোচনা করেছিলেন কথা কিংবা বাকের ধরন বা ঘরানা (স্পিচ জঁরা) নিয়ে। স্পিচ জঁরা বা বাক-ঘরানার সংজ্ঞায়নে তিনি বলেন–

> Each separate utterance is individual, of course, but each sphere in which language is used develops its own relatively stable types of these utterances. These we may call speech genres citation with page number.

অর্থ্যাৎ ব্যক্তিসাপেক্ষে উচ্চারণ একক হলে সার্বিকভাবে এটি কোনো না কোনো ধরনের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, আর এসব ধরনই হচ্ছে স্পিচ জঁরা বা বাক-ঘরানা। বাখতিন মূলত এখানে এই সব বিভিন্ন কথা আলাদা আলাদা ধরন-ধারণা এবং মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাদের সম্পৃক্ততার বিশদ অনুসন্ধান করেন। এই আলোচনাতে, বাখতিন একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঘটনা হিসাবে ভাষার প্রকৃতির সন্ধান করেছেন, একইসাথে জোর দিয়েছেন মানুষের চিন্তাভাবনা এবং আচরণ গঠনে বাক-ঘরানার ভূমিকার উপর। তিনি বলতে চেয়েছেন যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বাকশৈলীগুলি কেবল একক কোন উচ্চারণই নয় বরং ক্রমশ গতিশীল এবং বিকশিত এক ভাষিক সত্তা যা নিয়ত পরিবর্তনশীল। সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটগুলোকে এইসব ঘরানা প্রতিফলিত করে যেখানে মূলত ব্যবহার করা হয় সচেতনভাবে কিংবা আটপৌরেভাবে। মিখাইল বাখতিনের (১৯৮৬)তত্ত্ব অনুসারে, এই বাক-ঘরানার ধারণাটি বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্র জুড়ে বিভিন্ন রকমের ভাষার ধরনকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে: দৈনন্দিন কথোপকথন বা সংলাপ, দৈনন্দিন বিভিন্ন বর্ণনা, বিভিন্নভাবে লেখার প্রকাশ, সামরিক আদেশ, ব্যবসায়িক নথিপত্র, আনুষ্ঠানিক ভাষ্য বা বয়ান যা সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবেই বহুমুখী, বৈজ্ঞানিক বিবৃতি এবং সাহিত্যের ধরন; সবমিলিয়ে মানুষের যোগাযোগের মধ্যে বিদ্যমান বাক-ঘরানার বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিকে কার্যকরভাবে রূপ দিয়েছে। বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা যদি রাজনৈতিক ভাষার সমকালীন

রূপকে বিশদ পরিসরে বুঝতে চাই তো আমাদের যে সকল বাক-ঘরানা বা ধরনে রাজনৈতিক ভাষার ছাপ আমরা দেখতে পাই সেগুলোর কিছুটা আলোচনা বলেই প্রতীয়মান হয়।

রাজনীতির ভাষা বর্তমানকালে ছড়িয়ে পড়েছে প্রাত্যহিক জীবনযাপন থেকে আন্তর্জালের নিয়মিত বিচরণে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিবৃতিই নয়, বরং জনসাধারণের সাথে সংজ্ঞাপনের যে যে উপায় আছে, সবখানেই ভাষার রাজনৈতিক বিম্বটি আমরা প্রত্যক্ষ করি। চারপাশের দেয়াললিখনে আমরা দেখি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শ্লোগান থেকে বিধিনিষেধের আরোপণ। একই সাথে বিভিন্ন ছবি, গ্রাফিতিও দেখা যায় দেয়াললিখনের ভাষার অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে। ক্ষমতার ভাষাকে প্রমাণ করা আমিত্ব কিংবা অন্যরা 'বাইনারি'-র নিয়মিত উপস্থাপন যেখানে আমিত্ব মানে সঠিক এবং অপর বা অন্যরা অবস্থান করে শুধুই ভুল অন্যায়ের পরিধিতে। আমরা রাজনীতির এই ভাষার আরও উত্তেজিত উপস্থাপন পেয়ে যাই রাজনীতির মাঠের বক্তৃতার ভাষা যেখানে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন এবং বিরোধী তকে আক্রমণ করা হয় ঐ ভাষিক হাতিয়ার হিসেবেই। আবারও, অরওয়েল এবং আবদুল হাই স্মর্তব্য এইকারণেই, তাদের বর্ণিত রাজনীতির ভাষার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যবহারের নমুনা আমরা এই সবকিছুতে লক্ষ করি। আরও বিশদ পরিসরে যদি আমরা রাজনৈতিক ভাষার ক্ষেত্রকে দেখতে চাই, আমরা দেখতে পাই গণমাধ্যম ও তার সঞ্চালনার ভাষায় গড়ে উঠেছে এক নতুন ভাষাভঙ্গি যেখানে প্রায়শই স্বাভাবিক কথোপকথনের যে ভাষিক নিয়ম সেটির ইচ্ছাকৃত ব্যত্যয় ঘটানো হয়। এখানে ব্যক্তি আক্রমণ, কথার মাঝখানে কথা, উচ্চস্বরের আলাপ উপস্থিতি এখন অবাক করার মতো ব্যাপার আর নয়। আমরা যখন মিছিলের ভাষাকে রাজনীতির ভাষা হিসেবে আলোচনায় আনি আমাদের সবার আগে স্মরণে রাখতে হয় মুঠিবদ্ধ হাত আর চিৎকার করা স্লোগানের সম্মিলন। মিছিলের ভাষা সামগ্রিক এবং অনেক বেশি অবাচনিক যোগাযোগ নির্ভর। 'জ্বালো রে, জ্বালো; আগুন জ্বালো' এবং বাংলাদেশি বনাম বাঙালি জাতীয়তাবাদের পার্থক্যের বয়ানধর্মী শ্লোগানও আমাদের জানান দেয় রাজনীতির ভাষার ভিন্নধর্মী নমুনা। একই নিরিখে, পোস্টার সংস্কৃতিও আমাদের রাজনৈতিক ভাষার দৃশ্যচিত্র উপস্থাপনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এখানে চিত্র আর টেক্সট বা লেখাভিত্তিক বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাষ্যের সরাসরি দাবি আমরা দেখে থাকি। তা সে ভোটের মার্কা থেকে শুরু করে কোন নেতার মুক্তি বা শুভেচ্ছাবার্তাও যেমন থাকে, তেমনি থাকে একটা ক্ষমতার প্রচ্ছন্ন ছাপ। একইসাথে ক্ষমতার বাইরে যারা থাকে তাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার কথা তুলে ধরা হয়। 'অমুক' মার্কায় ভোট দিন- অথবা দ্রব্যমূল্য কমাও কিংবা 'তমুক' এর মুক্তি দাও- এরকম ছাঁচের পোস্টার আমাদের দৈনন্দিনতার অংশ। যেমনটা ভিটগেনস্টাইন বলেছিলেন, যখন আমাদের কিছুই বলার থাকে না আমাদের নীরবতার কাছেই সমর্পিত হতে হয়- এই ব্যাপারটা জনসাধারণ যখন এক ভঁয়ের সংস্কৃতিতে বাস করে তখন তাদের প্রায়শই বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রসঙ্গে নীরব থাকতে হয় কিংবা নিজেদের মনোভাব প্রকাশে বিরত থাকতে হয়। কিংবা রাজনীতির ভাষায় যখন নিজেদের ক্রিয়াকলাপের অযথার্থ ব্যাখ্যা রাজনীতিকরা দিয়ে থাকেন ভাষার খেলার ভেতরে (যেমনটা অরওয়েল স্পষ্টতই বলেছেন) তখন বহুবিধভাবে নীরবতার মাধ্যমেও মূল জনগণ তার একান্ত মনোলগের মাধ্যমেই প্রতিবাদ

জানান। রাজনীতির ময়দানে বা রাজনীতির ভাষিক খেলায় ধর্মের ব্যবহার ঐতিহাসিকভাবে সত্য। আমরা দেখতে পাই ধর্মভিত্তিক যেসব রাজনৈতিক দল বা সংগঠন রয়েছে, তারা প্রায়শই তাদের বয়ানে ব্যবহার করেন এমন শব্দসমূহ যেগুলো মূলত ধর্মভিত্তিক শব্দ। যাদের মূল অনেকাংশেই বিদেশী ভাষার শব্দ। মূলধারার রাজনৈতিক দলও এই কাজটি নিয়মিতভাবেই করেন যেহেতু ধর্ম জনমানুষের বিশ্বাসের সাথে বেশ জোরালোভাবেই মিলে থাকে। আমরা দেখতে পাই একইসাথে সহিষ্ণুতা এবঙ্গ অসহিষ্ণুতার ভাষার উপস্থিতি, যেটির ব্যবহার রাজনীতিকেরাও যেমন করেন, আবার একইসাথে জন ও গণ এই দুই 'বর্গের' অধিকাংশ মানুষ ব্যবহার করেন। উচ্চকণ্ঠের আলাপে আমরা প্রতিদিনের বিভিন্ন বাক-ঘরানায় যেমন প্রতিবাদের ভাষার আওয়াজ আমরা শুনি বা দেখি, একইসাথে ক্রোধের বিশদ বর্ণন আমরা জেনে যাই প্রতিহিংসার ভাষার ব্যবহারে, যা এই এখনকার বর্তমানে খুবই সরব। এর বিপরীতে, ব্যঙ্গের ভাষাও হয়ে যায় উলটো কথায় বলা রাজনৈতিক ভাষ্যের এক চিত্তাকর্ষক উদাহরণ। সেটি যেমন মৌখিকভাবেও হয়ে থাকে, তেমনি লিখিতভাবেও বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাষ্যের সমালোচনায় আমরা এই ব্যঙ্গের ভাষার ব্যবহার দেখে থাকি যেখানে রূপক, উপমান এবং উপমিত, বাগধারা প্রভৃতি ভাষিক কৌশল প্রযুক্ত হয়। আমরা দেখতে পাই, রাজনৈতিক ভাষা আমাদের বাক-ঘরানার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতায় উঠে আসে বিচিত্রভাবে। এখানে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলোর বাইরে আমরা দেখতে পাই আরও বহুবিধ ক্ষেত্র যেখানে রাজনীতির ভাষা ক্রমাগত বর্ধিত পরিসরে ক্ষমতায়নের একও নিমিত্ত হিসেবে কাজ করে, বহুদিন আগেই অরওয়েল এবং হাই–তাঁদের লেখায় তুলে ধরেছেন।

গণতান্ত্রিক সমাজে, রাজনীতির ভাষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ মূলত সুস্পষ্ট এবং ব্যবহারিক, এবং যা বিকল্প মতামতের উপস্থাপনেও সমানভাবেই কার্যকর হবে– এমন আশাবাদই ব্যক্ত করা হয়ে থাকে; এবং একটি আদর্শ পরিস্থিতিই এমন হওয়াই বাঞ্ছনীয় কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা যে ভাষিক-সামাজিক বাস্তবতায় বাস করি, রাজনীতির ভাষার অবস্থান এর একেবারে বিপরীতমুখী (Hudson, 1978)।

৬.

ভাষা নিছক যোগাযোগের একটি হাতিয়ার নয় বরং ক্ষমতা-কাঠামোর গতিশীলতার প্রকাশক একটি শক্তিশালী অনুষঙ্গ, তা আমরা ব্যক্ত করেছি বিভিন্নিভাবেই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে, ভাষা এবং ক্ষমতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বেশ কয়েকটি প্রপঞ্চের উল্লেখসাপেক্ষে নমুনায়ন করা সম্ভবপর। সেরকম কয়েকটি প্রপঞ্চ আলোচনা করা যায়। প্রথমেই আসা যাক, রাজনীতিবিদের প্রমিত ভাষা বনাম আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের প্রবণতার দিকে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিরা প্রায়শই আনুষ্ঠানিক পরিবেশে বাংলা ভাষার একটি আনুষ্ঠানিক সংস্করণ ব্যবহার করেন। ভাষার এই রূপটি তাদের কর্তৃত্ব এবং অভিজাতপনার নিদর্শনকেই প্রকাশ করে, এই পরিশীলিত স্তরের ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতারা নিজেদেরকে জ্ঞানী এবং বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে তুলে ধরে জনমানুষের কাছে। এছাড়াও, ভাষার এই

রূপভেদটিও সাধারণ জনগণের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। যদিও এ ঘটনাটি পরিশীলতা প্রকাশ করতে চায় শুধুই আনুষ্ঠানিকতার নিমিত্তে, কিন্তু এই প্রবণতাটি মূলত তাদের নির্বাচনী অঞ্চল বা গ্রামীণ এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম। এই ভাষাগত বিভাজন বিদ্যমান সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসকে শক্তিশালী করে তোলে, যেখানে ধনিক রাজনীতিক বা নব্য অভিজাতদের ভাষা মূলত ক্ষমতা, শক্তি এবং জ্ঞানের প্রতীক, এবং অন্যদিকে জনসাধারণের ভাষা সাধারণপনা এবং ক্ষমতার অভাবকেই উপস্থাপন করে। এর বিপরীতে দেখা যায়, সাধারণ জনগণ যে ভাষা ব্যবহার করে তা আরও কথোপকথন নির্ভর এবং সহজেই সংজ্ঞাপনযোগ্য। ব্যক্তিগত পরিসরে ভোটারদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা প্রায়শই প্রচারণা, সমাবেশ এবং জনসভার সময় এই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে থাকেন। বিশেষ করে নির্বাচনী প্রচারণার সময়, বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা প্রায়শই সাধারণ জনগণের সাথে যুক্ত হওয়ার তাগিদেই বাংলা ভাষার আরও কথ্য রূপ গ্রহণ করেন। এই কৌশলগত 'কোড-সুইচিং' রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ব্যবধান কমাতে সাহায্য করে। দৈনন্দিন ভাষা ব্যবহার করে, রাজনীতিবিদরা তাদের শ্রোতাদের চাহিদা এবং উদ্বেগের প্রতি আরও বেশি সম্পর্কযুক্ত এবং সহানুভূতিশীল হওয়ার চেষ্টা করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র রাজনৈতিক বয়ানকে আরও বোধগম্য করে, একই সাথে রাজনৈতিক পরিচয় ও সাধারণ সংহতির জনবোধও গড়ে তোলে। দ্বিতীয়ত, ভাষা একইসাথে রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি ও বর্জনের জন্য একটি শক্তিশালী কৌশল হতে পারে। রাজনৈতিক বক্তৃতায় আঞ্চলিক উপভাষা এবং আদিবাসী ভাষাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, রাজনীতিবিদরা ভাষাগত বৈচিত্র্যের জন্য অন্তর্ভুক্তি এবং সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত দিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক প্রচারণার সময়, রাজনীতিবিদরা তাদের বক্তৃতার কিছু অংশ চাকমা, মারমা প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীদের ভাষা যুক্ত করেন প্রায়শই। এই প্রয়াস ঐ নৃগোষ্ঠীদের ভাষাগত ঐতিহ্যকে স্বীকার করে, সম্মান করে, জাতিসত্তা ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের অনুভূতিকেও প্রভাবিত করে। এরই উলটো পথে লক্ষ করা যায়, ভাষার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীকে প্রান্তকতার দিকে ঠেলে দেয়া এবং তাদেরকে অস্বীকার করার নজিরও আমরা দেখতে পাই। বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়সমূহে, সংসদীয় বিতর্ক এবং সরকারী নথিতে, বাংলার একচেটিয়া ব্যবহার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বাংলা ব্যতীত অন্যান্য ভাষীদের এক রকমের অদৃশ্যই করে দিতে চায় প্রকারান্তরে। অধিকন্তু, বিপন্নপ্রায় বিভিন্ন আদিবাসী ভাষার অবমাননাকর চিত্র বা মূলধারার মিডিয়াতে তাদের প্রতিনিধিত্বের অভাব সামাজিক ও রাজনৈতিক বর্জনকে ক্রমশ স্থায়ী রূপ দেয়ার পথে নিয়ে যায়। আরও লক্ষ করা যায়, রাজনৈতিক ব্যক্তিরা আদিবাসী ভাষাগুলিকে বর্ণনা করার জন্য 'অনগ্রসর' শব্দটা ব্যবহার করেন, তখন এটি নেতিবাচক স্টেরিওটাইপগুলো বা গতবাধা ধ্যানধারণাকেই শক্তিশালী করে এবং সেই সম্প্রদায়গুলির সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচয়কে আরও দুর্বল করে। কেননা এই উপস্থাপনা কেন যে এই 'অনগ্রসরতা' সেই ব্যাখ্যা বা কার্যকারণ ছাপিয়ে যেন এক মেনে নেয়ার বাস্তবতাকে তুলে ধরে।

৭.

আজকের বহতা বিশ্বের নিওলিবারেলিজম বা নব্যউদারনীতিবাদের এই সময়কালে বিশ্বায়ন, গণমাধ্যমের চালিকাশক্তি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, আন্তর্জাল প্রভৃতি অনুষঙ্গের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভাষা পেয়েছে তুমুল বহুমাত্রিকতা। অরওয়েলের এবং হাই-এর রাজনৈতিক ভাষার আলোচনার সাথেও তাই তুলনা করা যায় সমসাময়িক এসব প্রপঞ্চের। দিনের চব্বিশ ঘণ্টার সংবাদ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ক্যাম্পেইন, ইন্টারনেটের ফলে যুক্ত আন্তর্জাতিকতা ও সময়ের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার সক্ষমতা- সবকিছুরই আবির্ভাবের সাথে ভাষাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক জনমত নিজেদের পক্ষ-বিপক্ষের মাপকাঠিতে প্রভাবিত করা যায়। আবদুল হাই এর রচনায় আমরা দেখেছি শুধুমাত্র মুদ্রণযন্ত্রের ফলেই কীভাবে পক্ষ বা বিপক্ষের উভয় দিকের রাজনৈতিক দল কীভাবে ছাপানো কাগজে ভাষার রাজনৈতিকতাকে এগিয়ে দেয়। আর সেখানে তথ্য-উপাত্ত-তত্ত্বের ছাড়িয়ে যে আধুনিকতম সব মাধ্যম, সেখানে প্রতিটি রাজনৈতিক দল জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য রাজনৈতিক ভাষানির্ভর বিভিন্ন বিষয়বস্তু (কন্টেন্ট) প্রচার করে বিভিন্ন অনলাইন পেইজ, ওয়েবসাইটের উপাত্ত, অডিওভিস্যুয়ালসহ আরো ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে। একইসাথে, অসাধু আকারে অস্পষ্ট এবং বিভ্রান্তিকর ভাষার মাধ্যমে সত্যের সত্য উপস্থাপন সম্পর্কে অরওয়েলের উদ্বেগসমূহ প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন আধুনিকতম সেসব অনুষঙ্গের মাধ্যমে, যা আমরা ইতোঃপূর্বেই হাই-এর লেখনীর সাথে বর্তমানের সম্পৃক্ততায় দেখেছি। রাজনীতির ভাষার এইসব কার্যকৌশল বর্তমানে দেশীয় পরিসর ছাপিয়ে একটি বৈশ্বিক ঘটনা হয়ে উঠেছে কমবেশি একটা সাধারণীকরণ-সাপেক্ষে জনগোষ্ঠী এবং সরকার ভাষার রাজনৈতিক স্বরূপের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তা সে ভাষিক অস্পষ্টতা প্রয়োগের নিমিত্তেই হোক, বা ক্ষমতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় কিংবা বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি রক্ষার্থেই হোক না কেন। একদিকে যেমন এইসব কৌশলের ফলে ভাষিক আধিপত্যের বিস্তার ঘটছে, সেই একই সমান্তরালে বিশ্বায়নের ফলে ভাষিক পরিচয়ের সংগ্রাম ক্রমশ হয়ে উঠছে তীব্রতর। অনেক ভাষা বিপন্নতার সম্মুখীন হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছে, কারণ প্রভাব বিস্তারকারী ভাষাগুলো (যেমন বৈশ্বিকভাবে ইংরেজি ভাষা, আবার বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা) বিশ্বব্যাপী ব্যবসা, গণমাধ্যম, এবং উচ্চশিক্ষায় প্রাধান্য পেয়ে চলেছে। সুতরাং বর্তমানের রাজনীতির ভাষিকতার প্রেক্ষিত সামগ্রিকতার বিচারে একইসাথে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ এবং ভাষিক সংরক্ষণের একটি দ্বিবিধ নিয়ামক হিসেবে ক্রিয়াশীল, যা হাই এবং অরওয়েল- উভয়ের ভাষ্যকেই নিজ অন্তর্দৃষ্টিসহ ধারণ করে আছে।

ক্রমবর্ধমান আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে বিপন্ন ভাষাসমূহের জন্য ভাষিক অধিকারের সমতাকে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রবল ভূমিকা থাকে রাজনৈতিক ভাষার নিখাদ প্রেক্ষিতের। বহুসাংস্কৃতিক এবং বহুভাষিক সমাজে ভাষাগত পরিচয়ের লড়াইয়ে প্রতিরোধ এবং পরিচয়ের দাবির ধারক হিসাবে ভাষার যে গুরুত্ব তা প্রকারান্তরে আমরা দেখেছি এই দুই মহান লেখকের ভাষা ও রাজনীতির সম্পৃক্ত প্রবন্ধসমূহে। উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষিক অধিকারের

আন্দোলনগুলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সুশাসনের অপরিহার্য দিক হিসাবে বর্তমানে বিবেচ্য। সেসব অঞ্চলের আদিবাসী ভাষা বলার, শেখানোর এবং সংরক্ষণের অধিকারের উপর জোর দেয়া হয় যেন তা টিকে থাকে আধুনিক সময়ের সাথে। একইভাবে, ইউরোপে, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদা নিয়ে যে আন্দোলন (যেমনটা হয়েছে কাতালান, বাস্ক এবং ওয়েলশের পক্ষে) চলে আসছে, জাতীয় ভাষানীতি এবং স্থানীয় ভাষাগত পরিচয়ের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্বকেই চিত্রিত করে। একটি সময়কালে যখন ভাষা একত্রিত বা বিভক্ত করতে পারার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাসীন নীতিনির্ধারকদের অবশ্যই উচিত কাজটি হবে ভাষাগত ঐক্যের প্রচার এবং ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষার মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখার স্বচ্ছতা। যে ভাষানীতিসমূহ সংখ্যালঘুদের ভাষার সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে উপেক্ষা করে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলার এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার ঝুঁকি তৈরি করে, সেগুলোকে থামানো জরুরি। আর ভাষাগত সংযুক্তিকে উৎসাহ দেয়, এমন নীতিগুলো শক্তিশালী সামাজিক সংহতি এবং সাংস্কৃতিক স্থিতিস্থাপকতাকে জোরদার করে যেন একটি ভাষিক অঞ্চলের ভাষাগত ঐতিহ্য বজায় থাকে এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক সমাজে ভাষাগত বৈচিত্র্যকে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয় সামাজিক-রাজনৈতিক সহাবস্থানের মাধ্যমে।

৮.

জর্জ অরওয়েলের ‘পলিটিক্স অ্যান্ড দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ’ এবং আবদুল হাইয়ের বাংলা ভাষার নিরিখে ‘রাজনীতির ভাষা’-র আলোচনার তুলনামূলক এই বিশ্লেষণ, ভাষা যেভাবে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে একইসাথে সার্বজনীন এবং নির্দিষ্ট স্থানিক প্রতিবেশে সক্রিয় থাকে, সেই অবস্থাটিই উপস্থাপন করেছে এবং সমকালীন সময়েও এদের প্রাসঙ্গিকতা উন্মোচন করেছে। অরওয়েল এবং হাই, উভয়েই বিশ্লেষণ করেছেন, ভাষা একটি নিরপেক্ষ মাধ্যম তো নয়ই, বরং জনমানসের রাজনৈতিক বোধের ছাঁচ তৈরিতে, মতাদর্শিক অবস্থানকে সংহত করতে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিকেও তুমুলভাবে বদলে দেয় ক্রমশ, ধীরে-ধীরে অথচ অন্তঃগঠনের একেবারে ভেতর থেকে। একদিকে, অরওয়েল পশ্চিমা ভাষ্যের রাজনৈতিক কথনে ভাষার অস্পষ্টতা এবং আরোপিত বিবৃতির উপর আলোকপাত করেন, অন্যদিকে আবদুল হাই ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে ভাষার রাজনীতিকে নিরীক্ষা করেন পাকিস্তানে বাংলা ভাষাভাষীদের উপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়া কীভাবে বাঙালির পরিচয়কে ক্ষুণ্ন করতে এবং সামাজিক-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার চেষ্টা করেছিল তাও চিত্রিত করে। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ কাজ একীভূত করে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, রাজনৈতিক ভাষার সরাসরি যে প্রভাব রয়েছে ব্যক্তিমানুষের স্বাতন্ত্র্য, সম্মিলিত সামাজিক পরিচয়, এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর যৌথতার সামগ্রিক বিষয়-আশয়ে। একইসাথে, এই পুনর্পাঠ অরওয়েলের এবং হাইয়ের ভাষিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক স্থির ধারণায় উপনীত হয়। সেই ধারণাকে মূলত যুক্ত করেছে ভাষিক বশীকরণের পশ্চিমা-বয়ান যার ভিত্তি অরওয়েলিয়ান ভাষ্য এবং ভাষিক আধিপত্যের উত্তর-ঔপনিবেশিক বিশ্লেষণ যার কেন্দ্রে রয়েছেন আবদুল

হাই। শেষ পর্যন্ত একথা বলাই যায়, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে সমালোচনা করতে সক্ষম নাগরিকদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্যও রাজনীতির ভাষা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অতীত থেকে শুরু করে বর্তমানের সময়রেখার ভাষিক স্মারকসমূহের সবগুলো পাঠই নিশ্চিতভাবেই এই সাক্ষ্য দেয়।

মূল পাঠ

মুহাম্মদ আবদুল হাই (১৯৯১)। তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা, ঢাকা গ্রেট বেংগল লাইব্রেরী, ঢাকা।

Orwell, G. (2013). Politics and the English language. Penguin Books.

তথ্যনির্দেশ

নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তী (২০২১)। ভাষার মুক্তি - ভাষা থেকে ভালোবাসা, স্পার্ক বাংলা, কলকাতা, ভারত।

হাসান আজিজুল হক (২০১৮)। ভাষা, ভাষাদর্শন, বাংলা ভাষাঃ রাষ্ট্রে সমাজে প্রয়োগবৃত্তান্ত, পাললিক সৌরভ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

আ. ন. ইয়াকভলেভ, অনুবাদঃ ননী ভৌমিক (১৯৭৫)। রাজনীতির মূলকথা, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, সংযুক্ত রাশিয়া।

Bakhtin, M. M. (1986). Speech genres and other late essays. University of Texas Press.

Biletzki, A. (1997). Talking wolves: Thomas Hobbes on the language of politics and the politics of language. Kluwer Academic Publishers.

Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Harvard University Press.

Carol L. S. (2001). *The Politics of language: Conflict, identity, and cultural pluralism in comparative perspective*: Oxford University Press

Corcoran, P. E. (1990). Language and politics. In D. L. Swanson & D. Nimmo (Eds.), New directions in political communication (pp. 51-85). Sage Publications.

Foucault, M. (1981). The Order of Discourse. Routledge.

Geis, M. L. (2012). *The Language of Politics.* Springer Science & Business Media.

Hudson, K. (1978). *The Language of Modern Politics.* The Macmillan Press Ltd.

Lasswell, H. D., & Leites, N. C. (1949). Language of politics: Studies in quantitative semantics. G. W. Stewart Publishing.